ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতিনির্দেশনা

Sweden
Sverige

B+HR
Business and Human Rights
Asia-Pacific

UNDP

জাতিসংঘের
"সুরক্ষা, মর্যাদা ও প্রতিকার"
কাঠামোর বাস্তবায়ন

ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক
নীতি-নির্দেশনা

জাতিসংঘের
"সুরক্ষা, মর্যাদা ও প্রতিকার" কাঠামোর বাস্তবায়ন

জাতিসংঘ
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়

ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)

Sweden
Sverige

B+HR
Business and Human Rights
Asia-Pacific

UNDP

নোট:

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত কোনো ব্যাখ্যা এবং উপকরণের উপস্থাপন কোনো দেশ, অঞ্চল, নগর বা এলাকা, এদের কর্তৃপক্ষ, বা সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের মতামতের প্রতিফলন নয়।

জাতিসংঘের কোনো দলিলের প্রতীক বড় হাতের অক্ষরে লিখিত এবং সঙ্গে চিত্র যুক্ত থাকে। এ ধরণের কোনো চিত্রের উল্লেখ জাতিসংঘ দলিল নির্দেশ করে।

প্রকাশনায়:
ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)
আইডিবি ভবন, রোকেয়া সরনী এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

©২০২০ বাংলা সংস্করণের জন্য জাতিসংঘ
সকল স্বত্ব বিশ্বব্যাপী সংরক্ষিত

প্রকাশক এ মর্মে স্বীকার করছেন যে মূল প্রকাশনাটি জাতিসংঘের কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে এর প্রকাশনা হিসাবে জারী করা হয়েছে। প্রকাশনাটি জাতিসংঘের জন্য এবং তার পক্ষ থেকে প্রকাশিত। বর্তমান কাজটি একটি অনানুষ্ঠানিক অনুবাদ যার সম্পুর্ন দায়িত্ব প্রকাশক গ্রহন করছেন।

সূচিপত্র

১. মানবাধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব ০৫

ক) মৌলিক নীতিমালা ০৫
খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা ০৭

২. মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষায় কর্পোরেটসমূহের দায়িত্ব ১৬

ক) মৌলিক নীতিমালা ১৬
খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯

৩. প্রতিকারের উপায় ৩০

ক) মৌলিক নীতিমালা ৩০
খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা ৩১

এই প্রকাশনায় "ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা: জাতিসংঘের সুরক্ষা, মর্যাদা ও প্রতিকার কাঠামোর বাস্তবায়ন" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি মানবাধিকার, বহুজাতিক সংস্থা ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আলোকে প্রস্তুত করেছেন। বিশেষ প্রতিনিধি মানবাধিকার পরিষদের (এ/এইচআরসি/১৭/৩১) কাছে পেশকৃত তাঁর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নীতি-নির্দেশনাসমূহ সংযুক্ত করেছেন, যাতে নীতি-নির্দেশনাসমূহ বিষয়ে প্রারম্ভীক বক্তব্য এবং নীতিসমূহের বিকাশ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি ভূমিকা যুক্ত করা হয়েছে।

মানবাধিকার পরিষদ ১৬ জুন ২০১১ তারিখের ১৭/৪ নম্বর প্রস্তাবনায় নীতি-নির্দেশনাসমূহ অনুমোদন করেছে।

সাধারণ নীতিমালা:

নীতি-নির্দেশনাসমূহের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত বিষয়সমূহ:

ক) মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা এবং এর সুরক্ষা প্রতিপালনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

খ) সমাজে বিশেষ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের যে ভূমিকা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য সকল আইন মান্য করা এবং মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষা

খ) অধিকার ও কর্তব্য লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ও কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থার সাথে তার সমন্বয় সাধন

এই নীতি-নির্দেশনাসমূহ আকার, বিভাগ, স্থান, মালিকানা এবং কাঠামো নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এই নীতি-নির্দেশনাসমূহকে সুসঙ্গতভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং ব্যবসা ও মানবাধিকারের মান ও অনুশীলনের উৎকর্ষ সাধনে তাদের যেসব উদ্দেশ্যসমুহ রয়েছে তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে ও সমন্নিতভাবে নীতি-নির্দেশনাসমুহের পাঠোদ্ধার করতে হবে, যাতে প্রভাবিত ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান ফলাফল অর্জন করা যায় যা সামাজিকভাবে টেকসই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

এই নীতি-নির্দেশনাসমূহের কোনো কিছুকে এমন ভাবে ব্যখ্যা করা উচিৎ নয় যা আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো বাধ্যবাধকতা তৈরি করে অথবা মানবাধিকার রক্ষার উদ্দ্যেশ্যে কোনো রাষ্ট্রের গৃহীত আইনী বাধ্যবাধকতাসমূহ বা এ সম্পর্কিত কোনো আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রটি আছে এমন আইনকে সীমায়িত বা অবজ্ঞা করে।

এই নীতি-নির্দেশনাসমূহ অবৈষম্যমূলক পন্থা অবলম্বন করে বাস্তবায়ন করতে হবে, বিশেষভাবে নজর দিতে হবে গোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা, সেই সাথে চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি যা তাদেরকে দুর্বল ও প্রান্তিক হয়ে ওঠার মত ঝুঁকির সম্মুখীন করে, এবং যথাযথ বিবেচনায় রাখতে হবে সেইসব ঝুঁকিকে, নারী এবং পুরুষ বিভিন্নভাবে যেগুলোর সম্মুখীন হয়।

১. মানবাধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ক) মৌলিক নীতিমালা

১. রাষ্ট্র তার ভৌগলিক পরিসীমা/অধীভুক্ত এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবে। মানবাধিকারের অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজন কার্যকর নীতি, আইন, বিধিমালা এবং রায়ের মাধ্যমে এর প্রতিকার, তদন্ত, শাস্তি ও প্রতিকারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা।

মন্তব্য

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি রাষ্ট্রের বাধকতার জন্য প্রয়োজন নিজস্ব ভূখন্ড এখতিয়ার-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তার মানবাধিকার পূরণ। এই দায়িত্বের অংশ হিসেবে রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার সাধন।

রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মানদন্ড হচ্ছে সুরক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য। বেসরকারি সত্ত্বা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্র সমান ভাবে দায়ী নয়। তবে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি রাষ্ট্র তার বাধকতা লঙ্ঘন করলে অথবা মানবাধিকারের অপব্যবহার প্রতিরোধ, তদন্ত, শাস্তি ও প্রশমনে রাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে মানবাধিকার অপব্যবহারের দায় তার উপর বর্তাতে পারে। যেহেতু এ সকল পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা রয়েছে, তার উচিৎ পূর্ণ বৈধতার সাথে নীতি, আইন, বিধিমালা এবং মীমাংসাসহ প্রতিরোধমূলক এবং প্রতীকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয় বিবেচনা করা।

রাষ্ট্রের আরও দায়িত্ব হলো আইনের শাসন রক্ষা ও তার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইনের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিতকরণ, এর প্রয়োগে পক্ষপাতহীনতা ও পর্যাপ্ত জবাবদিহিতা, আইনগত নিশ্চয়তা এবং প্রক্রিয়াগত ও আইনগত স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা।

এ অধ্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং অধ্যায়-৩ এ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২. নিজস্ব ভুখন্ড/ এখতিয়ারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেন তাদের পরিচালিত কর্মকান্ডে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান পোষণ করে সে ব্যপারে রাষ্ট্র তার প্রত্যাশা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করবে।

মন্তব্য

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অতি রাষ্ট্রিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক নয়। স্বীকৃত এখতিয়ারের ভিত্তিতে তাদের সাধারনত এই নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ থেকে নিবৃত্তও করা যায় না।

এসকল সূচকের আলোকে কিছু মানববাধিকার চুক্তি সংস্থা সুপারিশ করে যেন রাষ্ট্র বিদেশে তার এখতিয়ারভুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মানবাধিকার অপব্যবহার প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিশেষত রাষ্ট্র যেখানে নিজে ব্যবসাসমূহের সাথে যুক্ত অথবা সে সব ব্যবসায়ের সহায়ক, সে ক্ষেত্রে বিদেশে ব্যবসাসমূহের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রত্যাশা ব্যক্ত করার নীতিগত কারণ রয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রকথনযোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সুসঙ্গত ও ধারাবাহিক বার্তা প্রদান এবং রাষ্ট্রের নিজস্ব সুনাম রক্ষা করা।

এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহ একাধিক পন্থা গ্রহন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পন্থাসমূহ যার বহির্গত প্রভাব রয়েছে। উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে মূল কোম্পানি কর্তৃক তার প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট প্রদানের আবশ্যিকতা; শিথিল-আইন সংক্রান্ত বহুপক্ষীয় দলিল, যেমন গাইডলাইন ফর মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ অব দ্য অরগানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট; এবং প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের মান যা বৈদেশিক বিনিয়োগের সহায়ক। অন্যান্য কর্মপন্থা সরাসরি রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে আইন এবং এর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর অধিভুক্ত হলো অপরাধ সম্পর্কিত শাসন ব্যবস্থা যার অধীনে অপরাধীর বিচারকার্য তার নাগরিকত্তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, অপরাধ যেখানেই সংঘটিত হোক না কেন। রাষ্ট্রের উপলব্ধিগত ও যুক্তিযুক্ত আচরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা

সাধারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ও নীতিগত কার্যক্রমসমূহ

৩. মানবাধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের যা করা উচিত:

ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত যেসব আইন রয়েছে বা এতে প্রভাব ফেলে এমন যেসব আইন রয়েছে সেগুলো প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং পর্যায়ক্রমে এ জাতীয় আইনের পর্যাপ্ততার মূল্যায়ন করে তাতে বিদ্যমান ফাঁকসমূহ পূরণ করা;

খ) এটা নিশ্চিত করতে হবে যে যেসব আইন ও নীতির ভিত্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় যেমন- কর্পোরেট আইন; এমন কোনো আইন বা নীতি যেন মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনকে সীমিত না করে বরং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনে সক্ষম করে তোলে;

গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কীভাবে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে সেই বিষয়ে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করা;

ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাবগুলোর সমাধান কিভাবে করছে সেগুলোকে জ্ঞাপন করার জন্য তাদের উৎসাহিত করা, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের থেকে চেয়ে নেয়া।

মন্তব্য

রাষ্ট্রের এটা মনে করা উচিত নয় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাতিক্রমহীন ভাবে রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তাকে অগ্রাধিকার দেয় অথবা তা থেকে সুবিধা লাভ করে, এবং তাদের উচিৎ ব্যবসা ক্ষেত্রে মানবাধিকারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দুই ধরণের ব্যবস্থার একটি মিশ্রণ বিবেচনা করা- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছা গ্রহণমূলক ।

যে সকল আইন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদানকে নিয়ন্ত্রণ করে সেসব আইন প্রয়োগে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা প্রায়শই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনী ফাঁক-ফোকর হয়ে থাকে। এমন ধরণের আইনগুলোর পরিধি বৈষম্যহীনতা এবং শ্রম আইন থেকে শুরু করে পরিবেশগত, সম্পত্তি, গোপনীয়তা এবং ঘুষনিরোধ আইন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। অতএব, এসব আইনগুলো বর্তমানে যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কী-না, এবং যদি না হয়, কী কী কারণে হচ্ছেনা এবং কী কী যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ অবস্থার উন্নয়ন করা যায় এসব বিবেচনায় আনা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আইন ও নীতিগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় কাভারেজ দেয় কী-না এবং প্রাসঙ্গিক নীতিমালার সাথে যৌথভাবে আইনগুলো মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে কী-না তা পর্যালোচনা রাষ্ট্রের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- আইন ও নীতিমালার কিছু কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দরকার; এর মধ্যে আছে সেসব আইন যা ভূমিতে প্রবেশাধিকার এবং তার স্বত্ত্ব ও মালিকানাসহ বিষয়গুলো পরিচালনা করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব আইন অধিকার ভোগকারী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন।

যেসব আইন ও নীতিমালা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে- এমন ধরণের আইনগুলো হলো- কর্পোরেট ও নিরাপত্তা আইন যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ধরণগুলো নির্ধারণ করে দেয়। তবুও, মানবাধিকার-এর ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্যের অনুধাবন অপ্রতুল রয়ে গেছে। যেমন- কর্পোরেট ও নিরাপত্তা আইনের আওতায় এটা পরিষ্কার নয় যে মানবাধিকারের ব্যাপারে কোন কোম্পানী ও তাদের কর্মকর্তা কী কী করার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত, প্রয়োজনীয়তা তো দূরের কথা। আইন ও নীতিসমূহ সক্ষম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত নির্দেশনা দিবে যাতে তারা বিদ্যমান পরিচালনা কাঠামোর মধ্যে মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে সমর্থ হয়। যেমন কর্পোরেট বোর্ড।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকারের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা রয়েছে তাতে প্রত্যাশিত ফলাফলগুলো সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকতে হবে এবং তাদের সেরা অনুশীলন সম্পর্কে অবগত করতে হবে। উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে, এর আওতায় থাকবে মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক করণীয়, জেন্ডার-এর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কতটা কার্যকরভাবে বিবেচনা করা যায়, অসহায়ত্ব/প্রান্তিকীকরণ, এবং আরও অন্যান্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে যা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, জাতি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে প্রভাবিত করে।

জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো যা প্যারিস নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা হচ্ছে রাষ্ট্রের মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনসমূহ মানবাধিকার বিষয়ে বাধ্যবাধকতাগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কী-না তা সনাক্ত করবে এবং একই সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সংস্থাগুলোকে মানবাধিকার বিষয়ে পরামর্শ সহায়তা দিবে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে মানবাধিকারের উপর প্রভাব সম্বোধন করবে তার প্রজ্ঞপ্তির ব্যপ্তি স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণকে জানানোর জন্য প্রতিবেদন করা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রজ্ঞপ্তির প্রতি রাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা; ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর মাত্রা বৃদ্ধির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে স্বপ্রনোদিত প্রতিবেদনের উদ্যোগকে যে কোনো বিচারিক বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ ধরণের প্রজ্ঞপ্তির বিশেষ গুরুর্ত্ব রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে ব্যবসা পরিচালনার ধরণ ও প্রেক্ষিত থেকে মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বেগজনক ঝুঁকি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে প্রজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করবে, নীতিমালা ও আইনের আওতায় এর পরিষ্কার উল্লেখ থাকা দরকার যা প্রবেশাধিকার ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

কী কী বিষয় মিলিয়ে কার্যকর প্রজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করা হবে তার জন্য ব্যক্তি এবং সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষার ওপর সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করতে হবে ; বাণিজ্যিক গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ চাহিদাসমূহ এবং কোম্পানীর আকার ও কাঠামোর বিদ্যমান পার্থক্যের কারণে তা ভিন্ন হতে পারে।

আর্থিক প্রতিবেদনে মানবাধিকারের প্রভাবগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা উচিত; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'বস্তুগত' অথবা 'তাৎপর্যপূর্ণ' যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মসম্পাদনকে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্র ও ব্যবসার যোগসূত্র:

৪. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সহায়তা বা সেবা পায় এমন প্রতিষ্ঠান- রপ্তানী নির্ভর সংস্থা, বিনিয়োগ জীবন-বীমা অথবা গ্যারান্টি সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে মানবাধিকারের জন্য আবশ্যিক করণীয় হিসেবে রাষ্ট্রকে অতিরিক্তি কিছু পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন।

মন্তব্য

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের আইনের আলোকে মানবাধিকার রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং সামষ্টিক ভাবে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষায় প্রচলিত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের কার্যক্রম বিন্যস্ত হয় সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপরন্তু, একটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের যত কাছাকাছি থাকে বা রাষ্ট্রীয় সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের বা কর সহায়তার উপর যত বেশী নির্ভরশীল হয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের নীতি ততটা যৌক্তিকভাবে শক্তিশালী হবে।

যেখানে রাষ্ট্রসমূহের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা বলে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত নীতিমালা, আইন ও বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন সর্বাধিকভাবে নিশ্চিত করতে পারে। উচ্চতর পদাধিস্টিত ব্যবস্থাপনাসমূহ সাধারনত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা, এবং সংযুক্ত সরকারি বিভাগের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে যেখানে মানবাধিকারের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কী-না তা পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে (এসকল প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কর্পোরেট দায়বদ্ধতা রয়েছে; যা অধ্যায়-৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।

রাষ্ট্র রীতি অনুসারে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সহায়তা বা সেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে রপ্তানী নির্ভর সংস্থা, সরকারি বিনিয়োগ জীবনবীমা অথবা গ্যারান্টি সংস্থা এবং উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যখন এসব সংস্থাসমূহ লাভবান প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবাধিকার-এর ক্ষেত্রে যথাযথ এবং সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে না, তখন তারা তাদের সুনাম, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং এ সকল ক্ষতি রোধকল্পে সম্ভাব্য আইনী শর্তাদির ক্ষেত্রে নিজেদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে, এবং তা গ্রহণকারী রাষ্ট্রকে মানবাধিকার-এর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, প্রকল্প সহায়তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অন্য যেকোন সরকারি সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক করণীয় নির্ধারণে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে রাষ্ট্র উৎসাহিত করবে। মানবাধিকার বিষয়ে যেখানে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে এমন ব্যবসা ক্ষেত্রে বা ব্যবসার কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক করণীয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদানকৃত সেবা যা মানবাধিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, রাষ্ট্রসমূহ যখন এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, অথবা আইন প্রণয়ন করতে চায়, এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা আছে তা যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে কি-না তার পর্যাপ্ত তদারকি করা সমীচীন।

মন্তব্য

রাষ্ট্র যখন এমন সেবা প্রদান কার্যক্রম বেসরকারিকরণ করে যা মানবাধিকার উপভোগকে প্রভাবিত করতে পারে, তখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি তার বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র যদি এটা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মানবাধিকার বিষয়ে যে বাধ্যবাধকতা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করছে না তবে রাষ্ট্রের নিজস্ব মর্যাদা ও আইনী পরিণতি উভয় দিকে এর প্রভাব পড়তে পারে।

গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে, প্রাসঙ্গিক সেবা চুক্তিসমূহ এবং সক্রিয় আইনসমূহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যাশা সুস্পস্টভাবে ব্যক্ত করবে। রাষ্ট্রকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথ ভাবে দেখার জন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. রাষ্ট্র যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালনা করে, তাদের মধ্যে মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা পোষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রও নানা ধরণের বাণিজ্যিক লেনদেন করে, কম পক্ষে ক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব সম্পাাদিত। এসব কার্যক্রম রাষ্ট্রকে ওইসব প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার রক্ষায় সতর্কতা ও এর প্রতি মর্যাদা পোষণ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বা সামস্টিক ভাবে বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকে, এর মধ্যে রয়েছে চুক্তির শর্ত যাতে প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ এলাকায় মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা

৭. যেহেতু দ্বন্দ্ব সংঘাতময় এলাকাতে স্থূল মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের উচিৎ নিশ্চিত করা যেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত না হয়ে যায়।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

ক) ব্যবসায়ী কার্যক্রম এবং ব্যবসায়ী সম্পর্কের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার বিষয়ে কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা চিহ্নিত, প্রতিরোধ ও নিরসনে রাষ্ট্রকে প্রথম দিকেই সম্পৃক্ত হওয়া উচিত;

খ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকির প্রভাব মূল্যায়ন ও নিরসনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত সহায়তা করা উচিত; এক্ষেত্রে জেন্ডার সংক্রান্ত সহিংসতা ও যৌন হয়রানীর মতো বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত;

গ) যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থূল মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো নিরসন করতে চায় না, সরকারি সহায়তা ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাদের প্রবেশাধিকার দিবে না;

ঘ) রাষ্ট্র এটা নিশ্চিত করবে যে, ব্যবসা সম্পর্কিত স্থূল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিরসনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের তাদের বিদ্যমান নীতিমালা, আইন, বিধি-বিধান প্রয়োগে যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।

মন্তব্য

রাষ্ট্রীয় সীমানা নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের ওপর মালিকানাকে ঘিরে এমনকি সরকারগুলোর নিজেদের কারণে কিছু কিছু ঘৃন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে- যেখানে প্রত্যাশা অনুসারে মানবাধিকারের রীতিনীতি কাজ করে না। দায়িত্বশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদেরকে এমন জটিল পরিস্থিতিতে মানবাধিকারের জন্য ক্ষতি করতে পারে এমন সব কাজ থেকে কীভাবে বিরত রাখা যাবে সে ব্যাপারে সবসময় রাষ্ট্রের কাছ থেকে পরামর্শ চায়। এমন পরিস্থিতিতে দরকার উদ্ভাবনী ও কার্যকরি পদ্ধতি, বিশেষত- জেন্ডার ও যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার- দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যা বিশেষভাবে ঘটে থাকে।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগে রাষ্ট্রসমূহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এলাকায় 'হোস্ট' রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মানবাধিকার সুরক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্র সমর্থ্য না-ও হতে পারে। যেখানে বহুজাতিক কর্পোরেশন সম্পৃক্ত সেখানে রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা রয়েছে কর্পোরেশন ও 'হোস্ট' রাষ্ট্র উভয়কে সহায়তা করা যাতে ব্যবসা কর্মকাণ্ড মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়- এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রও গুরুত্বপূর্ণ বাড়তি সহায়তা দিতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে নীতিমালার মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত সহায়তার জন্য, রাষ্ট্রসমূহ উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা, বৈদেশিক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সমূহ এবং রপ্তানিক্ষেত্রে সহায়তকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা রাজধানী ও দূতাবাস এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করবে; পাশাপাশি সংস্থাসমূহ এবং নিজ দেশীয় সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝেও সহযোগিতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে; সরকারী সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূর্বসতর্কীকরণের জন্য প্রারম্ভিক সতর্কতার সূচক তৈরি করবে; এবং এমন পরিস্থিতিতে যদি সংস্থাসমূহ যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় তবে কী পরিণতি হতে পারে তা-ও যুক্ত করতে হবে। এর আওতায় আরও থাকতে পারে সহায়তা বা সেবা প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতি, অথবা যেখানে এটা সম্ভব নয় সেখানে ভবিষ্যতে সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি বিষয়টি যুক্ত থাকবে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এলাকায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কী ধরণের সম্পৃক্ততার কারণে স্থূল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করা।

রাষ্ট্রেসমূহের উচিত তাদের নীতিমালা, আইন, বিধি-বিধান, এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঝুঁকি আশঙ্কাকে যথাযথভাবে নিরসন করতে পারছে কী-না তা পর্যালোচনা করা সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক করণীয় বিধান সংযুক্ত করেছে কী-না তা-ও দেখা। যেখানে রাষ্ট্র ফাঁক দেখবে সেখানে তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিবে। এর অধীনে রাষ্ট্র তার নিজস্ব এলাকা/এখতিয়ারের অধীনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটন বা সংঘটনের সহায়তা দানের ব্যপারে দেওয়ানী, প্রশাসনিক এবং ফৌজদারি দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো অনুসন্ধান করবে। অধিকন্তু, রাষ্ট্র এ ধরণের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিরসনে বহুমুখী প্রক্রিয়া গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে, পাশাপাশি কার্যকর যৌথ উদ্যোগগুলোকে সহায়তা করতে পারে।

এসকল পদক্ষেপসমূহ সশস্ত্র সংঘাতময় পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আইনের প্রতি বাধ্যবাধকতার সাথে সংযোজিত হবে।

নীতিগুলোর মধ্যে সাযুজ্য বিধান নিশ্চিতকরণ

৮. রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে সরকারি বিভাগ, সংস্থা, দপ্তর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের অনুশীলন ও কাঠামো নির্ধারণ করে তারা যেন নিজ নিজ মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা ও অঙ্গীকার রয়েছে তা যথাযথভাবে পূরণে উপযুক্ত তথ্য, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে।

মন্তব্য

ব্যবসার জন্য যেসব আইন ও নীতিমালা সংস্থা বিদ্যমান সেগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের মানবাধিকার বিষয়ে প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহের কোনো অনিবার্য বিরোধ নেই। তবে, অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের জন্য কঠিন ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের উচিত ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয় ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা যা জাতীয় নীতির সঙ্গে উলম্ব ও আনুভূমিক উভয় দিক থেকে সামঞ্জস্য বিধান নিশ্চিত করবে।

উলম্ব নীতি সাজুয্যকরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো- রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি তার বাধকতা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি, আইন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া গ্রহন করবে। আনুভূমিক নীতি সামঞ্জস্যকরণের অর্থ হলো- জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ের সমর্থন দানকারী এবং প্রস্তুত সংস্থা এবং দপ্তরসমূহ যারা ব্যবসা পরিচালনার কাঠামো নির্ধারণ করবে- এর মধ্যে রয়েছে সেসব সংস্থা যাদের দায়িত্ব হচ্ছে কর্পোরেট আইন ও সিকিউরিটি রেগুলেশন, বিনিয়োগ সংস্থা, রপ্তানি ঋণ ও বীমা, বাণিজ্য এবং শ্রম সম্পর্কিত এসোসিয়েশনগুলো- এসব বিষয়ে অবগত করতে হবে এবং মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের যে অঙ্গীকার সে আলোকে কাজ করতে হবে।

৯. রাষ্ট্র যখন অন্যান্য দেশ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারনে লিপ্ত হয় তখন তাকে অবশ্যই মানবাধিকারের প্রতি বাধকতা প্রদর্শনে দেশীয় নীতিমালার জন্য পর্যাপ্ত স্থান বজায় রাখা উচিৎ। যেমন, বিনিয়োগ চুক্তির ক্ষেত্রে।

মন্তব্য

এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্র বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি, যেমন- দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি, বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করে। কিন্তু এ ধরণের চুক্তি অভ্যন্তরীণ নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ চুক্তির শর্তাবলী নতুন মানবাধিকার আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে, বা এ চুক্তির আলোকে যদি কাজ করতে থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

অতএব, রাষ্ট্রসমূহের উচিত সম্পাদিত চুক্তির আলোকে মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদের পর্যাপ্ত নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো দাঁড় করানোর সামর্থ্য রয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এটা নিশ্চিত করা।

১০. রাষ্ট্রসমূহ যখন বহুজাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যদের হয়ে কাজ করবে তখন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করা সমীচীন:

ক) এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, ঐসব প্রতিষ্ঠান সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে মানবাধিকার বিষয়ে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতাকে বিঘ্নিত করবে না বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে নিবৃত করবে না;

খ) প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি বা সক্ষমতার ভিত্তিতে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহিত করতে হবে; ক্ষেত্র বিশেষে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে হবে- এর আওতায় কারিগরি সহায়তা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে;

গ) ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় অগ্রগতি সাধনও পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর লক্ষ্যে নীতি নির্দেশনাসমূহ তৈরি করতে হবে।

মন্তব্য

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্ধিতভাবে নীতিগত সামঞ্জস্যের প্রয়োজন, যেখানে রাষ্ট্র ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের সাথে যুক্ত হয়, যেমন- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র এ ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতাগুলো বজায় রাখবে।

এ সকল প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া, মানবাধিকার উন্নয়নে ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উত্তম চর্চাগুলো শেয়ার করতে পারে।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে গৃহীত সম্মিলিত পদক্ষেপ রাষ্ট্রকে ব্যবসাসমূহ কর্তৃক মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা দানের জন্য প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করতে পারে। তবে, তা করতে হবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের কর্মসম্পাদন আরও উন্নিত করার মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র, বহুজাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এ নীতি-নির্দেশনাগুলো মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি সাধারণ কাঠামো দিবে, যা সামষ্টিক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা সকল অংশীজনদের নিজ নিজ প্রেক্ষিত থেকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

২. মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষায় কর্পোরেটসমূহের দায়িত্ব

ক) মৌলিক নীতিমালা

১১. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। এর অর্থ হলো- প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যের মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার বিষয়ে বিরূপ প্রভাবসমূহ চিহ্নিত ও প্রতিকার করবে।

মন্তব্য

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যা তাদের প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বৈশ্বিক মান নির্ধারণ করে- যে স্থানেই তারা ব্যবসা পরিচালনা করুক না কেন। মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের যে বাধকতা রয়েছে তা স্বাধীনভাবে তার সক্ষমতা ও স্বদিচ্ছার সাথে পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এ বাধকতা কখনো নিঃশেষিত হবে না। মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় আইন ও নীতিমালার সাথে বাধকতার উর্ধে এর অবস্থান।

মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তাদের প্রতিরোধ, প্রশমন এবং যেখানে উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অঙ্গীকার পূরণের অংশ হিসেবে মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় আরও বাড়তি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে যা অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এসব পদক্ষেপ মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে যেন কোনো ব্যর্থতার ক্ষেত্র সৃষ্টি না করে।

মানবাধিকার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা পূরণে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিছুতেই খাটো করে দেখতে পারে, এমন কিছু করা উচিত নয় যা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

১২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া- সর্বনিম্নভাবে, সেগুলোর প্রতি যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলের অন্তর্ভুক্ত, এবং যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কর্মক্ষেত্রে মৌলক নীতিমালা ও অধিকারের ঘোষণায় মৌলক অধিকার হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত কর্মকান্ডের কারণে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের ওপর দৃশ্যমান প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যে কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এ সকল অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করা। বাস্তবে, অন্য কোনো শিল্প কারখানা বা অন্য প্রেক্ষিতের চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ঝুঁকি বেশি হতে পারে; এমতাবস্থায় যেসব ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যা হোক, পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর মানবাধিকার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা উচিত।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের মৌলিক বিষয়গুলোর একটি অনুমোদনযোগ্য তালিকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে আছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং তা সঙ্ঘবদ্ধকরণের মূল যন্ত্রসমূহ; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ, এর মধ্যে রয়েছে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত নীতিগুলি যা আইএলও-র কর্মস্থলে নীতি ও অধিকার সম্পর্কিত মৌলিক ঘোষণাপত্রে আটটি মূল কনভেনশন হিসাবে যুক্ত।

আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার-এর উপর প্রভাব বিস্তারকে মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপুর্ণ মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনী দায়বদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতা রয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার জাতীয় আইন ও সংশ্লিষ্ট কাঠামোর আওতায় অদ্যবধি ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

পরিস্থিতিভেদে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু জাতীয় মানদন্ড অনুসরণ করা প্রয়োজন হতে পারে। যেমন প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সুনির্দিষ্ট দল কিংবা জনগোষ্ঠী থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকারকে ব্যবসাসমূহ বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শণ করতে পারে, যাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাদের মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব থাকায় অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এর অংশ হিসেবে জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছে; নারী, জাতীয় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শিশু, প্রতিবন্ধী, প্রবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবার। উপরন্ত, যেখানে সশস্ত্র সহিংসতা চলছে সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানবিক আইনসমূহের মানদন্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

১৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দায়বদ্ধতা থেকে করণীয়সমূহ:

ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে যেন মানবাধিকারের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না হয় সে দিকে নজর রাখা এবং এ ধরণের প্রভাব সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে তা নিরসন করা;

খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত কার্যক্রম যা সরাসরিভাবে মানবাধিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেসব প্রতিকার ও প্রশমিত করা, তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের দ্বারা পণ্য ও সেবা যা সরাসরি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না-ও করতে পারে এমন প্রভাবগুলো মূল্যায়ন সাপেক্ষে তা প্রতিরোধ বা প্রশমিত করার উদ্দ্যোগ নিবে।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের কর্মকান্ডের কারণে বা অন্য পক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ীক সম্পৃক্ততার কারণে মানবাধিকারের প্রতি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। নীতি-নির্দেশনার ১৯-এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রভাব কীভাবে নিরসন করবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এ নীতি-নির্দেশনার উদ্দেশ্যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ও ত্রুটিসমূহকে তার কর্মকান্ড হিসাবে বোঝা হয়; এবং তার সাথে ব্যবসায়িক অংশীদার, ভ্যালু চেইনের সত্তাসমূহ এবং অন্য রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষ যারা এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা, পণ্য সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত তাদেরকে 'ব্যবসায়িক সম্পর্ক' হিসাবে বোঝা হয়।

১৪. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে দায়বদ্ধতা তা আকার, সেক্টর, কাজের ক্ষেত্র, মালিকানার ধরণ এবং কাঠামোভেদে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, কীভাবে এবং কী জটিলতার মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রতিকার করবে তা সূচকসমূহের তারতম্য ও গভীরতাভেদে আলাদা হতে পারে।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাদের দায়বদ্ধতা পালনের পন্থা অন্যান্য বিষয়ের মত তার আকারের সাথে আনুপাতিক হারে হবে। বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর কম সক্ষমতা থাকতে পারে এবং এদের প্রক্রিয়াগুলোও হয় অনেকটা অনানুষ্ঠানিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো আলাদা হয়। তাই তাদের নীতি-পদ্ধতিগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারের ওপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার যা-ই হোক না কেন এ বিষয়ে অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। প্রভাবের ব্যাপ্তিকে, তার স্কেল, পরিধি ও অপ্রতিবিধেয় বিষয়সমূহের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। কীভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজে এবং কর্পোরেট গ্রুপের সদস্য হিসেবে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দায়বদ্ধতা পালন করবে তা পরিস্থিতি ও এর ব্যাপ্তি ভেদে আলাদা হতে পারে। যাহোক, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপূর্ণ এবং সমভাবে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রর্দশনে দায়বদ্ধতা রয়েছে।

১৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন ও দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচিত আকার ও পরিস্থিতিভেদে উপযুক্ত নীতি-পদ্ধতিগুলো প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ:

ক) মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন ও দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য নীতিগত অঙ্গীকার ব্যক্ত করা;

খ) মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের জন্য এসব বিরূপ প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্তে তা চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া;

গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কারণে মানবাধিকারের ওপর যেসব বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয় বা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে সেগুলো প্রতিকারের প্রক্রিয়াগুলো সক্রিয় করা ।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জানতে হবে ও প্রকাশ করতে হবে কীভাবে মানবাধিকারের প্রতি তারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। যদি তাদের নির্দিষ্ট কিছু নীতি-পরিকল্পনা না থাকে তাহলে তাদের পক্ষে বিষয়গুলো চর্চা করা কঠিন। বিষয়গুলো নীতিমালার ১৬-২৪ অংশে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা

নীতিগত অঙ্গীকার

১৬. মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নীতি ঘোষণায় এ অঙ্গীকার পূরণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে, যার মধ্যে থাকতে পারে:

ক) এটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন পর্যায় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কি-না;

খ) প্রতিষ্ঠানের ভেতরে/বাইরের বিশেজ্ঞষরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত কি-না;

গ) ব্যবসায়ী অংশীদার এবং অন্য পক্ষ যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত কর্মকান্ড, পণ্য ও সেবার সাথে সরাসরি জড়িত তাদের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রত্যাশা লিপিবদ্ধ করা;

ঘ) প্রতিষ্ঠানের বাইরে বা ভিতরে কর্মকর্তা/কর্মচারির কাছে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সহজলভ্য কি-না;

ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ে পরিচালনা নীতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযুক্ত নীতিতে মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা

মন্তব্য

'বিবরণী' হলো একটি সাধারণ পদবাচ্য, এর অর্থ হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব, অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা পূরণের অংশ হিসেবে কি কৌশল স্থির করলো তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা।

নীতি বিবরণী যথাযথভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়েছে কি-না তা যাচাই করার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডভেদে ভিন্ন হতে পারে। তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন যা হতে হবে তথ্যসমৃদ্ধ, তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা গত জটিলতার কারণে এ বিবরণী তৈরিতে পার্থক্য হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দক্ষতা নেয়া যায়, তা হতে পারে বিশ্বস্ত অনলাইন অথবা লিখিত রির্সোস থেকে শুরু করে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া যেতে পারে।

প্রকাশিত অঙ্গীকারটি সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে। যাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি চুক্তিবদ্ধ তাদের অবগত করতে হবে যথাযথভাবে; অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে তারা যাদের সাথে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, যেমন- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, বিনিয়োগকারী এবং যেসব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে উদ্বেগজনক মানবাধিকার ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে তা থেকে শুরু করে অংশীজনদের মধ্যে যাদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

অঙ্গীকার বিষয়ে সংস্থার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট নীতি ও পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে এবং জবাবদিহিতার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এবং এ ব্যপারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

রাষ্ট্রসমূহকে যেমন নীতিগত সাজুয্য বিধানের কাজ করতে হবে তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতি পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সাজুয্য বিধানে তৎপর হতে হবে, যা তাদের বিস্তৃত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও সম্পর্ক পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। যেসব নীতি-পদ্ধতির মধ্যে এগুলো থাকতে পারে সেগুলো হলো- কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য কর্মসম্পাদনে সাফল্যের জন্য প্রণোদনা, ক্রয় অনুশীলন, তদবির কার্যক্রম যেখানে মানবাধিকার ঝুঁকিতে রয়েছে।

এসকল উপায়ে বা অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে নীতির বিষয়গুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ে এবং সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সংযুক্ত করতে হবে, অন্যথায় এসকল নীতি বিবরণী মানবাধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বা শ্রদ্ধা ছাড়াই কার্য করতে পারে, মানবাধিকার বিষয়ে আলাদাভাবে ভাবার দরকার হবে না।

মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যিক করণীয়:

১৭. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন ও মোকাবেলায় অধ্যাবসায়ের সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো- মানবাধিকার বিষয়ে বাস্তব এবং সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন, প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বয় ও করণীয় নির্ধারণ, প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা এবং প্রভাবগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে তা অবহিতকরণ। মানবাধিকার বিষয়ে অবশ্য করণীয়গুলো হলো:

ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট বা প্রভাবিত, বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যক্রম, পণ্য অথবা সেবাসমূহ যা সরাসরি মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলতে সহায়তা করে এমন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া;

খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকারগত জটিলতার কারণে মানবাধিকার বিষয়ে প্রভাব, ধরণ ও ব্যবসার প্রেক্ষিতভেদে তা ভিন্ন হতে পারে;

গ) চলমান থাকা প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ে ঝুঁকিগুলোর ধরণও বদলে যেতে পারে, এটি স্বীকার করে নিতে হবে।

মন্তব্য

মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক দায়িত্ব পালনের সূচকসমূহ এ নীতির আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা নীতিমালার অপরিহার্য অংশ হিসেবে ১৮ থেকে ২১-অংশে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার বিষয়ে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবসমূহকে মানবাধিকারের প্রতি ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা হয়েছে। সম্ভাব্য এসব বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ অথবা প্রশমনের মাধ্যমে দূর করা সংগত, কোন সৃষ্ট প্রভাবকে প্রতিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে (নীতিমালা ২২)।

প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃহৎ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় মানবাধিকার বিষয়ে আবশ্যক করণীয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোন কোম্পানীর কাছে কেবল তার ভৌত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত বা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে না থেকে বিষয়টিকে এর উর্দ্ধে থেকে দেখতে হবে। নতুন কোন ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডের শুরু বা নতুন ব্যবসায়ীক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে মানবাধিকার বিষয়ে কার্যক্রমগুলো স্থির করা উচিত, যাতে নতুন চুক্তি বা সমঝোতা স্বাক্ষরের সময় মানবাধিকার বিষয়ে কোনো ঝুঁকি বাড়ার আশংকা থাকলে তা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়। সংযুক্তি বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হতে পারে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভ্যালু চেইনের আওতায় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে যেখানে মানবাধিকারের জন্য উপযুক্ত করণীয় বাস্তব কারণে কঠিন হয়ে পড়ে। যদি এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড এমন গুরুত্বপুর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবে যেখানে মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার ঝুঁকি বেশী, এক্ষেত্রে, কোন বিশেষ সরবরাহকারী বা মক্কেল কর্তৃক কর্মকান্ড পরিচালনা, কোন বিশেষ কর্মকান্ড, পণ্য ও সেবার সম্পৃক্ততা, অথবা অন্য কোন সম্পৃক্ত বিবেচনার ভিত্তিতে এদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

যখন অন্য পক্ষ মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে তখন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এই দুষ্কর্মের সাথে জড়িত থাকার প্রশ্ন উঠতে পারে। এ ধরণের জড়িত থাকা আইন বা আইনের বাইরে উভয় দিক থেকে হতে পারে। আইনের বাইরের বিষয় হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অন্য পক্ষের দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে; যখন দেখা যায় যে অন্য পক্ষের বিরূপ কর্মকান্ডের ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি উপকৃত হচ্ছে।

আইনগত দিক থেকে দেখলে, অধিকাংশ দেশের আইনে এ ধরণের অপকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ধরণের অপরাধ ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত। সাধারণত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হীন অপরাধে সম্পৃতার ভিত্তিতে সাধারণ নাগরিক কর্মকান্ড সঙ্ঘটিত হতে পারে, যদিও তা মানবাধিকার ধারণার আওতায় পড়তে নাও পারে। আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আইন বিজ্ঞানে উল্লেখ আছে, মানবাধিকার বিষয়ে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজে সহায়তা করা এবং তা মোকবেলায় জ্ঞাতসারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা বা উদ্যোগ না নেওয়া- জ্ঞাত সারে এ ধরণের অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা করার শামিল অথবা এতে উৎসাহ দেয়া যা অপরাধ সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনগত ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করা উচিত। যাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থেকে নিজেদের নিবৃত করতে প্রতিটি যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বয়ংক্রিয় বা সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনে সহায়তার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে তা মনে করা হয় না।

১৮. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত মানবাধিকার সম্পর্কিত যেকোন যথাযথ বা সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব যা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের কর্মকান্ড অথবা অন্যদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে ঘটছে/ঘটতে পারে সেসব ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়নে পদক্ষেপ নেওয়া। এ প্রক্রিয়ায় যা থাকবে:

ক) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অথবা স্বাধীন বাহ্যিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের আনয়ন;

খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার, পরিচালনের ধরণ ও ব্যবসার প্রেক্ষিত অনুসারে সম্ভাব্য প্রভাবিত দল ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনায় সম্পৃক্ত করা।

মন্তব্য

মানবাধিকার বিষয়ে দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততার ফলে সৃষ্ট মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথ ও সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা। এর উদ্দেশ্য হলো- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কোন কর্মকান্ডের কারণে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর ওপর কী কী বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা বোঝা। সাধারনত এ পদ্ধতির আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হলো- প্রস্তাবিত কর্মসূচি স্থির করার পূর্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন, কারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তা চিহ্নিত করা, মানবাধিকারের সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড ও বিষয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রস্তাবিত কর্মকান্ড ও ব্যবসায়ী সম্পর্ক কীভাবে মানবাধিকার বিষয়সমূহের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তার পরিকল্পনা করা।

এ প্রক্রিয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশেষ কোনো বিরূপ প্রভাব যা ব্যক্তি থেকে দল ও জনগণের প্রতি ঝুঁকি, অসহায়ত্ব ও প্রান্তিকীকরণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, এবং মনে রাখতে হবে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।

মানবাধিকারের প্রভাব মূল্যায়নের প্রক্রিয়া, অন্যান্য প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন- ঝুঁকি মূল্যায়ন অথবা পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানিবাধিকারের বিষয়গুলোকে রেফারেন্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেহেতু প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যত এ সকল অধিকারের উপর সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে।

মানবাধিকার পরিস্থিতি যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই মানবাধিকারের প্রভাবসমূহ নিয়মিত ভাবে মূল্যায়ন করা উচিত: তা করতে হবে নতুন যেকোন কর্মকাণ্ড শুরু বা ব্যবসায়ী সম্পর্ক তৈরি করার পূর্বে; যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্বে (যেমন- বাজারে প্রবেশ, নতুন পণ্য বাজারজাতকরণ, নীতি পরিবর্তন, অথবা ব্যবসায় বড় ধরণের পরিবর্তন); এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে (যেমন- সামাজিক অস্থিরতা বাড়লে) এবং ব্যবসা কর্মকান্ড ও সম্পর্ক থাকাকালীন নিয়মিত প্রান্তিকে মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূকে যথাযথভাবে মানবাধিকারের উপর প্রভাবের যথাযথ পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য তাদের প্রভাবিত ভাষা ও অন্যান্য সম্ভাব্য বাধাসমূহ বিবেচনায় রেখে অংশীজনদের সাথে আলোচনা করতে হবে। বিশেষ কোনো কারণে আলাপ-আলোচনা সম্ভবপর না হলে, যৌক্তিক বিকল্পগুলো বিবেচনায় নিতে হবে যেমন- বিশ্বাসযোগ্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যেমন মানবাধিকার সুরক্ষাকারী (Human Rights Defenders) এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন থেকে মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথ করণীয় নির্ধারণের কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা জানা যাবে।

১৯. প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে মানবাধিকার প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল গুলোর সমন্বয় সাপেক্ষে এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ও নিরসনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া সঙ্গত।

ক) কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার:

(১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার দায়িত্ব যথাযথ স্তর ও কর্মকান্ডের উপর ন্যস্ত করতে হবে;

(২) অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দ এবং সার্বিক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে;

খ) যথোপযুক্ত পদক্ষেপ পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হতে পারে:

(১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজের কারণে বা অন্যদের সহায়তা করতে গিয়ে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবসা, পণ্য বা সেবার কারণে বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হতে পারে

(২) বিরূপ প্রভাবের মাত্রা কতটুকু মোকাবেলা করা যাচ্ছে;

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আনুভূমিক সমন্বয়ের উপর মানবাধিকার বিষয়ে প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফল তখনই কার্যকর হবে যখন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের সঙ্গে মানবাধিকার সম্পর্কিত নীতি-অঙ্গীকার সংযুক্ত করা যায়। মানবাধিকারের প্রভাব মূল্যায়ন ফলাফল যে যথাযথভাবে বোঝা গেল, গুরুত্ব দেওয়া হলো এবং কর্মসূচি নির্ধারণ করা হলো তা নিশ্চিত হওয়া দরকার ।

মানবধিকার বিষয়ে প্রভাব মূল্যায়নের সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাস্তব ও সম্ভাব্য সব ধরণের বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাপ্ত ফলাফলের অনুভূমিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের প্রতিরোধ বা নিরসন করতে পারে। বাস্তবে ঘটা বিরূপ প্রভাব প্রতিকারযোগ্য বিষয় (নীতিমালা ২২)। যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিষয়ে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে বা করতে পারে তখন তা নিরোধ বা প্রশমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সঙ্গত।

যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিষয়ে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে বা করতে সহায়তা করে তখন এ ধরনের সহায়তা থেকে নিজেকে নিবৃত করা বা বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সঙ্গত এবং নিজের ক্ষমতাটুকু কাজে লাগিয়ে বিস্তৃত পরিসরে বাকি কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তা প্রশমন করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এ ক্ষমতা হলো অন্য কোন পক্ষের অসাধু চর্চা বদলে দেওয়ার সক্ষমতা যা কোন ধরণের ক্ষতি করতে পারে।

যেখানে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা, পণ্য বা সেবার কারণে মানবাধিকারের ওপর সরাসরি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করছে না, কিন্তু প্রভাবটি কোন না কোন ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড, পণ্য বা সেবা অথবা অন্য কোন পক্ষের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবে এ পরিস্থিতি বেশ জটিল বিষয়।

এই পরিস্থিতিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্পকে প্রভাবিত করবে তা হলো, ব্যবসায়ীক সর্ম্পক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, অপব্যবহারের মাত্রা কতটা তীব্র এবং ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বাতিল করলে তা মানবাধিকারের ওপর কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। পরিস্থিতি এবং মানবাধিকারের উপর এর প্রভাব যত জটিল হবে, এ বিষয়ে স্বাধীন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের উপদেশ নেয়ার ক্ষেত্রটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ততই শক্তিশালী হবে।

যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ বা নিরসন করতে পারে তবে তা করাই সঙ্গত। আর যদি তা না পারে তাহলে প্রতিষ্ঠান অন্য উপায় অনুসন্ধান করতে পারে; যেমন- মানবধিকারের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অন্য পক্ষের দক্ষতা উন্নয়ন, অথবা অন্য কোনো প্রণোদনা অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করা যেতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্তৃত্ব কাজে লাগিয়ে অংশীদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ বা মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। এমন পরিস্থিতে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সাপেক্ষে অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানা সমীচীন হবে।

যেখানে প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পর্কটা অত্যন্ত "গুরুত্বপূর্ণ" সেখানে এ সম্পর্কের সমাপ্তি আরও ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এ ধরণের অংশীদারি সম্পর্ক কখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় যদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের জন্য তার পণ্য বা সেবা অত্যাবশ্যক হয় এবং যেখানে যৌক্তিক কোনো বিকল্প উৎস না থাকে। এক্ষেত্রেও মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাবের তীব্রতাকে বিবেচনা করতে হবে। অপব্যবহার যত মারাত্মক হবে তত দ্রুত এ ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কী কী পরিবর্তন ঘটছে তা দেখতে হবে, ব্যবসায়ীক সম্পর্কেও পরিসমাপ্তি হবে কী-না তাও ভাবতে হবে। কোন কারণে যদি বিরূপ প্রভাব অব্যহত থাকে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক রক্ষা করে চলে; তবে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠান কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা তুলে ধরতে হবে, এবং বিদ্যমান সম্পর্কের ফল হিসাবে যেকোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে- তা প্রতিষ্ঠানের সুনাম, আর্থিক ও আইনী ক্ষেত্রে হতে পারে।

২০. মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে কি-না তা যাচাই করার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত তাদের সাড়া/প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা। যার ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে:

(ক) যথাযথ মানসম্মত পরিমাণগত ও গুণগত সূচকের ভিত্তিতে;
(খ) প্রভাবিত অংশীজনসহ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে মতামত সংগ্রহ করে।

মন্তব্য

এ পরিবীক্ষণটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন এই কারণে যে এতে প্রতিষ্ঠান জানতে পারে তার মানবাধিকার বিষয়ে যেসব নীতিমালা আছে তার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন হচ্ছে কী-না, নীতিসমূহ মানবাধিকারের উপর চিহ্নিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় যথাযথভাবে কাজে আসছে কী-না, এবং উন্নয়নের ত্বরান্বিত করণে সক্রিয় কিনা।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দল বা জনগণের মধ্যে থেকে, যেসব ব্যক্তিবর্গের ওপর মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব তাদের অসহায়ত্ব ও প্রান্তিকীকরণ বাড়িয়ে দিতে পারে এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিক্রিয়া কতটুকু কার্যকর হচ্ছে তা পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে। এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা সমীচীন।

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিবীক্ষণের বিষয়টি সংযুক্ত করতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে এমন হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে যা হয়ত প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কর্মসম্পাদন চুক্তি, পর্যালোচনা, জরিপ ও অডিট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজিত তথ্য ব্যবহার করতে পারে। অপারেশনাল-স্তরের অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলিও ব্যবসায় উদ্যোগের মানবাধিকারের বিষয়ে অবশ্য করণীয় সম্পর্কে সরাসরি প্রভাবিতদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে পারে (এর জন্য নীতিমালা ২৯ দেখুন)।

২১. মানবাধিকারের উপর প্রভাবকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে মোকাবেলা করে তা বিবেচনার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই প্রস্তুত থাকা উচিত যেন তা জনগণকে অবহিত করা হয়, বিশেষত যখন প্রভাবিতদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বা কার্যক্রমের কারণে মানবাধিকার বিষয়ে মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে তা কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো উচিত। যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

ক) মানবাধিকার বিষয়ে যে ধরণের বা মাত্রার প্রভাব দেখা যাক না কেন লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর তাতে যেন প্রবেশগম্যতা থাকে/সহজেই জানতে পারে;

খ) সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকার বিষয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন ঘটনা প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করবে;

গ) কর্মীদের বা বাণিজ্যিক গোপনীয়তার প্রয়োজনেও অংশীজনদের ওপর ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপের দিকে যাওয়া যাবে না।

মন্তব্য

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই এ সংক্রান্ত নীতি অন্তর্ভুক্ত, চর্চা ও বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ব্যক্তি, দল, সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ ও বিনিয়োগকারী যাদের ওপর মানবাধিকার বিষয়ে প্রভাব পড়তে পারে তা পরিমাপের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ স্থাপন করার মধ্যেই মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতীয়মান হবে। নানাভাবে যোগাযোগটা হতে পারে, যেমন আন্তঃব্যক্তিক আলোচনা, অনলাইন সংলাপ, ক্ষতিগ্রস্থদের সঙ্গে আলোচনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে। আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনের ধরণ ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে কর্পোরেট দায়বদ্ধতা বা টেকসই প্রতিবেদনসহ আর্থিক ও অনার্থিক তথ্যসহ অনলাইন হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনের তখনই আশা করা হয় যখন মানবাধিকারের উপর তীব্র প্রভাবের আশঙ্কা থাকে, তা ব্যবসার প্রকৃতি বা পরিচালণের কারণে সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রতিবেদনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারের বিষয় ও এর সূচকসমূহ কীভাবে চিহ্নিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ে স্বাধীন কোনো সংস্থা দ্বারা যদি প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু যাচাই করে নেওয়া যায় তবে তা প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিবে। সেক্টর ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সূচকসমূহ আরও বাড়তি তথ্য দিতে সহায়তা করতে পারে।

প্রতিকার

২২. যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকারের ওপর যে সব বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে সেগুলো চিহ্নিত করে, তাদেরকে বৈধ উপায় অনুসরণ করে তাদের এসব বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা বা করতে সহায়তা করা উচিত।

মন্তব্য

সবচেয়ে উত্তম নীতি বা চর্চা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে বা করতে সহায়তা করতে পারে, যা হয়ত প্রতিষ্ঠানটি আগে থেকে অনুমান করতে বা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

মানবাধিকারের জন্য আবশ্যক করণীয় বা অন্য পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে যখন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ ধরণের পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে পারবে, মানবাধিকারের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দায়বদ্ধতা পালনের জন্য তখন প্রয়োজন নিজ থেকে অথবা অন্যদের সহায়তায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর প্রতিকার করা। যাদের ওপর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা আছে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত অপারেশনাল-স্তরের অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রতিকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে পারে, যা নীতিমালার ৩১ অংশে সংযুক্ত আছে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কারণে মানবাধিকারের প্রতি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না হলেও, ব্যবসায়ীক সম্পর্কের কারণে সরাসরি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ব্যবসা, পণ্য বা সেবা থেকে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাবের জন্য প্রতিকার করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায় না, তবুও প্রতিকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রাখা উচিত। কিছু পরিস্থিতি, বিশেষত যেখানে সাধারণত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, সেখানে বিচারিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন। অধিকন্তু যেখানে মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির অভিযোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অভিযুক্ত সেখানে প্রতিকারের জন্য কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে, কীভাবে প্রতিকার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা যাবে তা তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গভিত্তিক বিষয়সমূহ

২৩. সকল পরিস্থিতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যা করা উচিত:

ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কিত জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে;

খ) মানবাধিকার বিষয়ে কোনো দ্বান্দ্বিক অবস্থা সৃষ্টি হলে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার নীতিমালার প্রতি কীভাব সম্মান প্রদর্শন করা যাবে তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে;

গ) কর্মকান্ড পরিচালনার সময় প্রতিপালনীয় বিষয় হিসেবে (compliance issue) কী কী ঝুঁকি থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে বা লঙ্ঘনে সহায়ক হতে পারে তা বিবেচনা করতে হবে।

মন্তব্য

যদিও কোন দেশের বা স্থানীয় প্রেক্ষিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়ীক সম্পর্কের মাধ্যমে মানবাধিকারের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দায়বদ্ধতা রয়েছে। যখন কোনো স্থানীয় বাস্তবতার কারণে এ দায়বদ্ধতা পুরোপুরি পালন করা যায় না তখন এটা আশা করা হয় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিবার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নীতিমালার প্রতি যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা দেখাবে, এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা প্রদর্শন করবে।

বিশেষ কিছু ব্যবসা পরিস্থিতি যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ এলাকা; যেখানে অন্যদের দ্বারা (যেমন. নিরাপত্তা বাহিনী) সার্বিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এমন অবস্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এ ধরণের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে (যেমন- নিরাপত্তা বাহিনী)। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ঝুঁকি আইনগতভাবে প্রতিপালনীয় হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন। কর্পোরেটের ক্ষেত্রে এ ধরণের পরিস্থিতি সম্ভাব্য আইনগত দায় বাড়িয়ে দেয় যা নিজস্ব কর্ম পরিবেশের বাইরে ভুক্তভোগী কর্তৃক বৈধ অভিযোগ হিসেবে উত্থাপিত হয়। বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করে রোম নীতিমালা যা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের মূলভিত্তি সেখানে কর্পোরেটের ফৌজদারি দায়বদ্ধতার বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও, কর্পোরেট পরিচালক, অফিসার ও কর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হতে পারেন যদি তারা মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভূমিকা রাখেন।

এ সকল জটিল পরিস্থিতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর এটা নিশ্চিত করা উচিত যে তারা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত করণীয় নিধারণে পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে কেবল বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে নয়, সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, এমনকি প্রতিষ্ঠানের বাইরে গ্রহণযোগ্য ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞ- তাঁরা হতে পারেন সরকারের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য অংশীজনদের মধ্য থেকে।

২৪. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকার বিষয়ে বাস্তব ও সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করা ও প্রাধান্যশীল বিষয়গুলো সনাক্তকরণ সাপেক্ষে সেগুলো প্রতিরোধ ও নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এমন বিষয় যার প্রশমনে পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব হলে তা অপরিশোধনযোগ্য হয়ে যেতে পারে।

মন্তব্য

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে তখন সকল প্রভাব একই সঙ্গে করা সম্ভব না-ও হতে পারে। নির্দিষ্ট আইনী নির্দেশনার অভাবে প্রভাবসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যদি জরুরী হয় তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের কালবিলম্ব না করে মারাত্মক বলে বিবেচিত হচ্ছে এমন সব বিরূপ প্রভাব সমাধানের জন্য চিহ্নিত করা সংগত, প্রভাব মূল্যায়ন করতে বিলম্ব হলে তা প্রতিকারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রভাবের ভয়াবহতা চূড়ান্ত কোন ধারণা নয়, তবে মানবাধিকারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্য বিষয়গুলোর সাথে তুলনামূলকভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো একে চিহ্নিত করেছে।

৩. প্রতিকারের উপায়

ক) মৌলিক নীতিমালা

২৫. ব্যবসা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এর সুরক্ষা করা। যখন রাষ্ট্রীয় পরিসীমা ও কর্তৃত্বের আওতায় এ ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তখন রাষ্ট্রকে যথাযথ বিচারিক, আইনগত এবং প্রয়োজনীয় অন্য যেকোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং ভুক্তভোগীর কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

মন্তব্য

রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় যদি তদন্তের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়, শাস্তি না দেয় এবং ব্যবসা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ না নেয় তাহলে মানবাধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা দুর্বল বা অর্থহীন হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে।

কার্যকর প্রতিকারে প্রবেশাধিকার পাওয়ার প্রক্রিয়াগত এবং স্বতন্ত্র দিক রয়েছে। এ সেকশনে অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলির আওতায় প্রতিকারের যে উপায়গুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে তার প্রকৃতি বৃহৎ পরিসরে হতে পারে যার উদ্দেশ্য হয় সাধারণত মানবাধিকারের জন্য ক্ষতিকর কিছু ঘটলে তা প্রতিহত করা বা উন্নত করা। প্রতিকারের আওতায় থাকতে পারে- দুঃখ প্রকাশ, পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া, পুনর্বাসন, আর্থিক বা অ-আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং শাস্তি আরোপ (তা হতে পারে অপরাধমূলক অথবা প্রশাসনিক বা জরিমানা)। একই সঙ্গে ক্ষতিকর সব কিছু থেকে নিবৃত করা, যেমন- নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নিশ্চয়তাপত্র পুনরায় অনুমোদন না করা। প্রতিকারের প্রক্রিয়া হতে হবে পক্ষপাতহীন, ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি থেকে প্রক্রিয়াটিকে মুক্ত রাখতে হবে।

এ নির্দেশনামূলক নীতির আলোকে, অভিযোগকে ব্যক্তি বা দলের মালিকানাবোধের ব্যাপার থেকে উৎসারিত বলে অনুধাবন করা যায়, যার ভিত্তি হতে পারে আইন, চুক্তি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অঙ্গীকার, প্রচলিত চর্চা অথবা ক্ষুব্ধ সম্প্রদায়গুলির ন্যায় বিচারের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা।

অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলি বলতে এমন কৌশলকে বুঝায় যা রাষ্ট্রীয় বা অরাষ্ট্রীয় সংস্থা পরিচালিত, বিচারিক বা অবিচারিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে এবং প্রতিকার চাওয়া যাবে।

রাষ্ট্র পরিচালিত অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলি পরিচালিত হতে পারে রাষ্ট্রীয় কোনো শাখা বা সংস্থা দ্বারা বা কোনো স্বাধীন, সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধানিক সংস্থার মাধ্যমে। এটা বিচারিক বা অবিচারিক হতে পারে। কোন কোন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী সরাসরি প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ জানাতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী কারো মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারেন। যেমন- আদালত (ফৌজদারি ও দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রে), শ্রম আদালত, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, গাইডলাইন ফর মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজেজ অব দ্য অরগানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর অধীন জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তি (National Contact Person), ন্যায়পাল অফিসসমূহ, সরকারি অভিযোগ গ্রহণকারী অফিসসমূহ।

ব্যবসা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়া নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা, কীভাবে প্রতিকার পেতে পারে, কী ধরণের সহায়তা পেতে পারে (আর্থিক বা বিশেষজ্ঞ পরামর্শ) সেসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে।

রাষ্ট্র পরিচালিত বিচারিক এবং অবিচারিক অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলির আওতায় প্রতিকার ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত কাঠামো দাঁড় করানো সমীচীন। এ ধরণের ব্যবস্থা থাকলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে সৃষ্ট ক্ষোভসমূহ শুরুতে প্রশমন করা যাবে। রাষ্ট্রীয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে গৃহীত অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলির সম্পূরক হিসাবে বা অধিকতর কার্যকর করার জন্য সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কৌশলসমূহের মাধ্যমে গৃহীত প্রশমনের কৌশলসমূহ ভূমিকা রাখতে পারে। এই কৌশলগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসরণীয় নীতি ২৬ থেকে ৩১এ উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) প্রয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা

রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা

২৬. রাষ্ট্রকে ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা মোকাবেলায় আভ্যন্তরীণ বিচার কাঠামোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিকারে আইনগত, বাস্তব ও বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা যা প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলে রাষ্ট্র উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেসব বাধা দূর করবে।

মন্তব্য

কার্যকর বিচার ব্যবস্থা প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিষয় হিসেবে কাজ করে। ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিকার করায় বিচার বিভাগের ক্ষমতা নির্ভর করে তার নিরপেক্ষতা, সততা এবং দক্ষতার সঙ্গে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার উপর।

আদালতে বৈধ অভিযোগগুলো দায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। যেখানে প্রতিকার পাওয়ার কার্যকর উপায়গুলো সহজলভ্য থাকে না সেখানে বিচারিক ব্যবস্থা প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ। বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির কারণে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না তা নিশ্চিত করতে হবে। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আদালত রাষ্ট্রের কোনো সংস্থা এবং ব্যবসায়ীক গোষ্ঠীর অর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত এবং মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের বৈধ ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে না। যে সকল আইনগত বাধাসমূহ যা ব্যবসা সম্পর্কিত প্রকৃত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন উদাহরণ হলো:

- যেভাবে আইনী দায়িত্ব ফৌজদারি ও নাগরিক আইনের অধীনে কর্পোরেট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আরোপিত হয়েছে তা যথাযত জবাদিহিতা এড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে;
- যেখানে অভিযোগকারী নিজের দেশে বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং অভিযোগের যথেষ্ট আইনী ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আদালতে যাওয়ার সুযোগ পায় না;
- যেখানে বিশেষ গোষ্ঠী, যেমন আদিবাসী জনগণ এবং অভিবাসী মানবাধিকার রক্ষায় আইনী সুযোগ থেকে বঞ্চিত যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তব ও পদ্ধতিগত বাধা উদ্ভূত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ:

- ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের থেকে নিবৃত করার জন্য অভিযোগ দায়ের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া, এবং/বা সরকারি সহায়তায় "বাজারভিত্তিক" কৌশল (যেমন মামলার জীবন বীমা এবং আইনগত সহায়তা ফি কাঠামো) অথবা অন্য কোনো উপায়ে যৌক্তিক পর্যায়ে কমানো;
- অর্থ অভাবে অথবা অন্য কোনো প্রণোদনার অভাবে অভিযোগকারী আইনী সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়;

- অভিযোগের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগগুলো সীমিত থাকলে অথবা প্রতিনিধিকে আইনী প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে সক্ষম করে তুলতে না পারলে (যেমন উন্নত ক্রিয়াকলাপ বা সমন্বিত কার্যপদ্ধতি) প্রতিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারে;
- রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীর ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা ও অনুসন্ধানে পর্যাপ্ত সম্পদ, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সহায়তার অভাব থাকে।

অনেকগুলো বাধা আছে যেগুলো যৌথ কারণের ফলে ঘটে থাকে অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি ও পক্ষের মধ্যে আর্থিক সামর্থ, তথ্য প্রবেশাধিকার এবং দক্ষতা বিষয়ে ভারসাম্যহীনতা থাকলে তা থেকে হতে পারে। অধিকন্তু, বৈষম্য যেখানে খুব বেশি ক্রিয়াশীল অথবা বিচার ব্যবস্থার বিন্যাস ও কার্যক্রমের ফলে অপ্রত্যাশিত প্রভাব সৃষ্টি হয় তা ব্যক্তি, দল এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রান্তিক করে তুলতে পারে। কখনও কখনও সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌত ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অভিযোগকারী বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় না এবং সুবিধা নিতে পারে না। এসব দল বা জনগণের অধিকার রক্ষায় প্রতিকার কৌশলের প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন; বিশেষত প্রবেশাধিকার, প্রক্রিয়া এবং ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য।

রাষ্ট্রীয় অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহ

২৭. ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের উচিত ব্যাপক ভিত্তিক কার্যকর ও যথোপযুক্ত নন-জুডিসিয়াল (Non-Judicial) বাইরে অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

মন্তব্য

বিচার ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে প্রশাসনিক, আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমনকি যখন বিচার যথেষ্ট কার্যকর ও সবদিক থেকে সম্পন্ন তখনও বিচার ব্যবস্থার পক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তর অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। এমনকি সবসময় বিচারিক প্রতিকারও জরুরি নয় এবং সবসময় অভিযোগকারীদের জন্য তা সহায়ক হয় না।

ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো নিরসনের ক্ষেত্রে যেসব ফাঁক রয়েছে উপযুক্ত উপায়ে তার নিষ্পত্তি করা যেতে পারে বিচার প্রক্রিয়ার বাইরের নন-জুডিসিয়াল (Non-Judicial) কৌশলের কর্মপরিধি বিস্তৃত করে অথবা নতুন কৌশল সংযুক্ত করে। এসব হতে পারে মধ্যস্থতাভিত্তিক কোনো কৌশল, মিমাংসা অথবা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত কিংবা অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া বা এগুলোর সমন্বয় হতে পারে। এসব নির্ভর করে জনস্বার্থ এবং সম্ভাব্য পক্ষ যারা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তার ভিত্তিতে অথবা অন্য পক্ষের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে। এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের জন্য নীতিমালার ৩১-এ নির্ধারিত সূচকের শর্তসমূহ পূরণ করবে।

এক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিচারব্যবস্থার প্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রকে ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়েরকৃত দলগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পন্থা গ্রহনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। দায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল বা জনগোষ্ঠী যেসব বাধার মুখে পড়ে যা তাদের অসহায়ত্ব ও প্রান্তিকীকরণে ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এসব বাধা ও ভারসাম্যহীন বিষয়গুলো কীভাবে কমানো যায় রাষ্ট্রের উচিত এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা ।

অ-রাষ্টীয় অভিযোগ প্রক্রিয়া (Non-state based grievance mechanisms)

২৮. ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকারের ক্ষতিকর দিকগুলো মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রের উচিত অ-রাষ্ট্রীয় অভিযোগ প্রক্রিয়াতে যেন অধিগত করার ক্ষমতা থাকে তা সহজতর করার বিষয়গুলো বিবেচনা করা।

মন্তব্য

অ-রাষ্ট্রীয় অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে এক প্রকার আছে যেখানে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজন, শিল্প সম্পর্কিত এসোসিয়েশন অথবা মাল্টিস্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গঠন করা হয়ে থাকে। এগুলো অ-বিচারিক ব্যবস্থা, তবে কেবল মিমাংসা, আলাপ-আলোচনা বা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত অধিকারমূলক যুতসই প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। এ প্রক্রিয়াসমূহ বিশেষ কিছু সুবিধা দিতে পারে; যেমন- ব্যয় ও সময় কমিয়ে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি বা প্রতিকার।

আরেকটি প্রক্রিয়া হতে পারে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে। এটা সাধারণত হয় যখন রাষ্ট্র মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ব্যাপারে তার বাধকতা লঙ্ঘন করে। অনেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সুরক্ষা দিতে না পারার বিষয়টিকে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা হিসেবে দেখেন।

রাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রশমনে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কীভাবে এর প্রতিকার পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টিতে রাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে।

২৯. মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ অতি দ্রুত এবং সরাসরি যাতে নিরসন করা যায় সেই লক্ষ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি বাস্তবায়িত পর্যায়ে (Operational-level) ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের জন্য অভিযোগ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে অথবা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

মন্তব্য

কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি যেসব ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিরূপ শিকার হওয়ার আশঙ্কায় আছে তারা অপারেশন লেভেল-এর অভিযোগ প্রক্রিয়াতে সরাসরিভাবে প্রবেশ করতে পারে। যাতে সহজে প্রতিকার পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবে। এগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজে বা অন্যদের সহায়তায় বা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাহায্যে পরিচালনা করতে পারে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য বাইরের বিশেজ্ঞদের সম্পৃক্তকরণের মাধমে বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে এগুলোর সুরাহা করতে পারে। তবে অভিযোগের শুরুতেই যে বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে হবে এমন না। তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরাসরি সম্পৃক্ত করে অভিযোগটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে যেকোন ক্ষতির সুরাহা কৌশল বের করতে পারে।

দায়িত্বের অংশ হিসেবে, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে অভিযোগ প্রক্রিয়ার দুটি প্রধান কাজ হলো-

ক) প্রথমত, মানবাধিকার বিষয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক দায়িত্ব হিসেবে এর বিরূপ প্রভাব চিহ্নিতকরণে সহায়তা করা। এটা করার উদ্দেশ্যে তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনের কারণে যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জন্য একটি চ্যানেল গঠন করে যার মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন মানবাধিকার সম্পর্কিত বিরূপ প্রভাবসমূহের প্রবণতা ও ধরণ মূল্যায়ন সাপেক্ষে পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলো সনাক্ত করতে পারে এবং সেই আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে;

খ) দ্বিতীয়ত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন দ্রুত এবং সরাসরি বিরূপ প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিকারে ব্যবস্থা নিতে পারে যাতে ক্ষতিকর কিছু না ঘটে এই অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহ তা সম্ভবপর করে, যার ফলে কোন ধরণের অনিষ্ট এবং ক্ষোভ যেন না বাড়ে তা সম্ভবপর করে তোলে।

এ কৌশলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো বিরূপ প্রভাব বিষয়ে যেকোন বৈধ অভিযোগ আগে-ভাগে চিহ্নিত করতে হবে। এ কৌশলের আওতায় অভিযোগ আসার জন্য অপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। তবে এর বিশেষ লক্ষ্য থাকে যেন বিরূপ প্রভাবের স্বীকার যারা তাদের বৈধ উদ্বেগসমূহ চিহ্নিত করা যায়। এসকল উদ্বেগ যদি চিহ্নিত ও মোকাবেলা করা না হয়, তবে তা বড় ধরণের সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে অভিযোগ প্রক্রিয়াতে অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট থাকবে যা এর কার্যকর প্রয়োগ/চর্চা নিশ্চিত করবে (নীতিমালা ৩১)। স্কেল, সম্পদ, সেক্টর, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সূচকের চাহিদার ভিত্তিতে অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো স্থির করা যেতে পারে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যাপক ভিত্তিক অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ, যৌথ দেন-দরবার প্রক্রিয়া কিন্তু কারো বিকল্প হতে পারবে না। শ্রম বিষয়ে যেসব মতভেদ আছে সে ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বৈধ ভূমিকা ছোট করে দেখার জন্য অথবা বিচারিক ও অ-বিচারিক অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বাধা সৃষ্টি করার জন্য অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহকে ব্যবহার করা যাবে না।

৩০. শিল্প, মাল্টিস্টেকহোল্ডার এবং অন্যান্য যৌথ উদ্যোগ যা মানবাধিকার মানদণ্ডের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সেখানে অভিযোগ প্রক্রিয়াসমূহের সহজলভ্য ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে।

মন্তব্য

মানবাধিকার সম্পর্কিত মানদন্ড ক্রমবর্ধমানভাবে শিল্প সংস্থা, মাল্টিস্টেকহোল্ডার ও অন্যন্যা যৌথ উদ্যোগী সংস্থার প্রতিশ্রুতির মধ্যে, আচরণবিধি, কর্মসম্পাদনের মান পদ্ধতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্তঃদেশীয় কর্পোরেশনের মধ্যে বৈশ্বিক সমঝোতাসমূহের মাধ্যমে ক্রমশ প্রতিফলিত হচ্ছে।

এসব যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ অথবা তাদের বৈধ প্রতিনিধি যেন তাদের উদ্বেগ তুলে ধরতে পারে যদি তারা মনে করে সংস্থাসমূহ যেসব অঙ্গীকার করেছে তা যথাযথভাবে পূরণ করছে না। অনেক যৌথ উদ্যোগসমূহ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে যদি তাদের অভিযোগ শোনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে। ব্যক্তি ও যৌথ উদ্যোগ উভয়ের জন্য এ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সকল প্রক্রিয়া জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং মানবাধিকারের বিরূপ প্রভাব প্রতিকারে ব্যবস্থা গ্রহনেও সহায়তা করবে।

অ-বিচারিক ব্যবস্থায় অভিযোগ প্রক্রিয়ার (Non-judicial grievance mechanisms) কার্যকর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

৩১. অ-রাষ্ট্রীয় অ-বিচারিক অভিযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য যা যা থাকা দরকার:

ক) বৈধতা: অংশী দলগুলোর কাছ থেকে আস্থা অর্জন করতে হবে, যাদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি বানানো হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতি কতটা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে;

খ) প্রবেশগম্যতা: প্রক্রিয়াটি যাদের উদ্দেশ্যে বানানো তাদের সকলেই যেন এ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে ও পরিচিত হতে পারে এবং যারা এ ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয় তাদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে;

গ) অনুমান করা: প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পর্যায়ের সময়সীমা ও ধাপগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে, প্রক্রিয়ার ধরণ, ফলাফল এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ-এর উপায়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে;

ঘ) সমতাভিত্তিক: এটা নিশ্চিত করতে হবে, ক্ষুব্ধ পক্ষ তথ্য-উপাত্তে, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞের কাছে যুক্তিসংগত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে যা তাকে ন্যায়সঙ্গত, তথ্যসমৃদ্ধ এবং মর্যাদাপূর্ণ অভিযোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করবে;

ঙ) স্বচ্ছতা: ক্ষোভ নিরসনের জন্য অভিযোগ দায়েরকারী পক্ষকে এর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত, যে কৌশলে কাজটি করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে সকল পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ, যাতে এর কার্যকারিতার উপর এবং ঝুঁকির মধ্যে জনস্বার্থে ভুমিকা পালন করা যায় ও আস্থা অর্জন করা যায়;

চ) অধিকারবান্ধব: এটা নিশ্চিত করতে হবে, যে ফলাফল ও প্রতিকার পাওয়া গেল তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ;

ছ) একটি অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার উৎস: প্রাসঙ্গিক পন্থা তৈরির মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের ক্ষোভ এবং ক্ষতির প্রতিকার করা যায়।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রক্রিয়াকে:

জ) সংযোগ ও সংলাপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে: যে অংশীজনদের জন্য এ কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের সঙ্গে এর ডিজাইন ও কর্মসম্পাদন বিষয়ে পরামর্শ করা এবং কী উপায়ে ক্ষোভ চিহ্নিত ও সমাধান করা হচ্ছে, সংলাপের সময় তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

মন্তব্য

অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলোর উদ্দেশ্য তখন বাস্তবায়ন হবে যখন জনগণ জানতে পারবে, বিশ্বাস করবে এবং এটা ব্যবহার করতে সামর্থবান হবে। এসব শর্তের আলোকে অ-বিচারিক অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলো যাতে যথাযথভাবে কাজ করে সে নিমিত্তে তা প্রণয়ন, সংশোধন ও মূল্যায়নের জন্য কিছু মানদন্ড দেয়া হয়েছে। দুর্বলভাবে নকশাকৃত ও বাস্তবায়িত অভিযোগ প্রক্রিয়াগুলো যা ক্ষতিগ্রস্থ অংশীজনদের মধ্যে ক্ষমতাহীনতা ও অশ্রদ্ধার অনুভূতি বাড়িয়ে দিতে পারে যা প্রতিকার বিষয়টিকে আরও ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

যেকোনো রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয়, মিমাংসা অথবা সংলাপভিত্তিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম সাতটি শর্ত প্রযোজ্য হবে। অষ্টম শর্তটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রযোজ্য হবে, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে। "Grievance Mechanisms" শব্দটি এখানে বিশেষ কলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার সবসময় একই রকম নাও হতে পারে। তবে কার্যকারিতার দিক থেকে দেখলে নির্ণায়কগুলো প্রায় একই রকম। সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কগুলো হলো:

ক) এ প্রক্রিয়াটি ব্যবহারের উপযোগীতা নিশ্চিত করতে হলে অংশীজনদের এর ওপর আস্থা থাকতে হবে। অংশীজনদের আস্থা অর্জনে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে যে কোন পক্ষ অভিযোগ প্রক্রিয়ার অবাধ কর্ম সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করছে না । তারা নায্য আচরণ পাচ্ছে যা অংশীজনদের থেকে আস্থা অর্জনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক;

খ) এ প্রক্রিয়ায় প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে বাধাগুলো হতে পারে- সচেতনতার অভাব, ভাষা, স্বাক্ষরতা, ব্যয়, ভৌত অবস্থান এবং প্রতিপক্ষ থেকে প্রতিশোধের ভয়;

গ) এ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্বস্ত ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য- এ থেকে ভুক্তভোগী কী উপকার পাবেন সেই সম্পর্কে তথ্য জানাতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ে নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলা উচিত; তবে প্রয়োজনে সময়সীমার ব্যাপারে কখনও কখনও নমনীয় হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে;

ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ক্ষতিগ্রস্থ অংশীজনদের মধ্যে ক্ষোভ বা বিরোধ থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ অংশীজনেরা তূলনামূলকভাবে তথ্যে ও মূল্যবান রিসোর্সে প্রবেশাধিকারের সুযোগ কম পায় এবং কখনও কখনও তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থসম্পদের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ ধরণের ভারসাম্যহীনতা দূর করা না গেলে এটা একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় অর্জন এবং উপলব্ধি উভয়ই হ্রাস করতে পারে এবং টেকসই সমাধানে পৌঁছানো আরও শক্ত করে তোলে;

ঙ) এ প্রক্রিয়ায় আস্থা ধরে রাখার জন্য জরুরী হলো অভিযুক্তকে অভিযোগ নিরসনের অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য জানানো। প্রক্রিয়াটির কর্মক্ষমতার ব্যাপারে অংশীজনদের কাছে স্বচ্ছতা রক্ষার্থে পরিসংখ্যানগত তথ্য, কেস স্টাডি অথবা কীভাবে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ দেখভাল করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানানোর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। বৈধ প্রক্রিয়াটি তুলে ধরতে হবে এবং আস্থা ধরে রাখতে হবে। একই সঙ্গে, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর মধ্যে বিনিময়কৃত সংলাপের গোপনীয়তা প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষা করা দরকার;

চ) ক্ষোভ সবসময় মানবাধিকার পরিপ্রেক্ষিত থেকে না-ও আসতে পারে এবং অনেকে প্রাথমিকভাবে মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিযোগ উত্থাপন না-ও করতে পারে। যা হোক না কেন, অভিযোগের ফলাফল যখন মানবাধিকারকে প্রভাবিত করে, তখন সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে যেন তা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়;

ছ) গৃহীত অভিযোগের পুনঃপুনকতা, ধরণ ও কারণ নিয়মিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াটি এমনভাবে পরিচালনা করতে পারে যাতে নীতিসমূহ, পদ্ধতিসমূহ এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন চিহ্নিত ও প্রভাবিত করা যায়;

জ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে অভিযোগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর নকশা ও কর্মক্ষমতা ঠিক করার সময় প্রভাবিত অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে তারা এটা অনুশীলন করে। এ প্রক্রিয়াটির সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে উভয়পক্ষের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৈধভাবে একই সাথে অভিযুক্ত হতে এবং ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে না, তাই এসব প্রক্রিয়ার জন্য উচিত সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাধান বের করা। যেখানে মিমাংসার দরকার সেখানে আইনসিদ্ধ ও স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে তা করাই সঙ্গত।